بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ জুন, ২০২১ মোতাবেক ০৪ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত খুতবাগুলোতে হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল এবং বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের (কথা) বর্ণনা করা হয়েছিল। **'হামরাউল আসাদ'** এর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, উহুদের যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে আসেন আর কাফিররা মক্কার পথ ধরে; কিন্তু কুরাইশদের পুনরায় আক্রমণের সংবাদ পেলে তিনি (সা.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে **'হামরাউল আসাদ'** (নামক) স্থান পর্যন্ত যান। **'হামরাউল আসাদ'** মদীনা থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

এই যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দাংশ তুলে ধরছি। বাহ্যত কুরাইশ বাহিনী মক্কার ফিরতি পথ ধরেছিল, (তবে) এই আশঙ্কাও ছিল যে, তাদের এই কাজ মুসলমানদের উদাসীন করার উদ্দেশ্যে হতে পারে। আর এ শঙ্কাও ছিল যে, পাছে তারা ফিরে এসে অতর্কিতে মদীনার ওপর আক্রমণ না করে বসে। এজন্য সেই রাতে মদীনায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়, আর বিশেষভাবে সাহাবীরা সারারাত মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দেন। প্রত্যুষে জানা যায়, এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না, কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে আর কুরাইশ নেতাদের মধ্যে এই জোরালো বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মদীনায় আক্রমণ করলে কেমন হয়! আর কোন কোন কুরাইশ পরস্পরকে ভর্ৎসনা করছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কেও হত্যা কর নি আর মুসলমান নারীদের দাসীও বানাতে পার নি, আর তাদের ধন-সম্পদও করায়ত্ত করতে পার নি, বরং তোমরা তাদের ওপর জয়যুক্ত হওয়ার পর এবং তাদেরকে নির্মূল করার সুযোগ লাভ করার পরও তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছ যাতে তারা পুনরায় শক্তি অর্জন করতে পারে। তাই এখনও সুযোগ আছে, ফিরে চল আর মদীনার ওপর আক্রমণ করে মুসলমানদের সমূলে উৎপাটিত কর। আরেক দল বলছিল, যা কিছু ঘটেছে একে পুরস্কার জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে চল; পাছে এমন না হয় যে, যুদ্ধ জয়ের ফলে সামান্য যে খ্যাতি লাভ হয়েছে তা-ও আবার হাতছাড়া হয়ে যায়, আর এই বিজয় পরাজয়ে রূপ নেয়। কিন্তু অবশেষে অতিউৎসাহী লোকদের মতামত প্রাধান্য পায় আর কুরাইশরা মদীনা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এই ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করেন মুসলমানরা যেন প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু পাশাপাশি এই নির্দেশও প্রদান করেন যে, যারা উহুদের (যুদ্ধে) যোগদান করেছিল তারা ছাড়া অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে না যায়। **(মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬, হামরাউল আসাদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত), {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ৫০৪-৫০৫)**

একস্থলে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, কুরাইশদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যখন মহানবী (সা.) জ্ঞাত হন তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁরা উভয়ে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। **{কিতাবুল মাগাযী লিল্ ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮, গযওয়াতু উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১৩ প্রকাশিত}**

'অতএব, উহুদের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) মুজাহেদীন বা যোদ্ধারা- যাদের অধিকাংশই আহত ছিলেন, (তারা) নিজেদের ক্ষতস্থান বেঁধে তাদের মনিবের সাথে যাত্রা করেন। আর লেখা আছে, এ সময় মুসলমানরা এরূপ আনন্দ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যাত্রা করে যেমনটি কোন বিজয়ী সৈন্যবাহিনী (বিজয়ের) পর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়। আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) **'হামরাউল আসাদ'**-এ পৌঁছেন। তখন যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল (তাই) তিনি (সা.) এখানেই শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, মাঠের বিভিন্ন স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হোক। অতএব, নিমিষেই **'হামরাউল আসাদ'** এর মাঠে পাঁচশ'টি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা দূর থেকে দেখা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়কে ভীত-ত্রস্ত করত। সম্ভবত এ সময়েই খুযাআ' গোত্রের মা'বাদ নামক একজন মুশরিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর (সা.) কাছে উহুদের যুদ্ধে নিহতদের বিষয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এরপর নিজ গন্তব্যে যাত্রা করেন। পরদিন তিনি **'রওহা'** নামক স্থানে পৌঁছে দেখেন কুরাইশদের সেনাবাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং পুনরায় মদীনা অভিমুখে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মা'বাদ ত্বরিৎ আবু সুফিয়ানের নিকট যায় এবং তাকে বলে, এ তোমরা কী করতে যাচ্ছ? খোদার কসম! আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর সেনাবাহিনীকে **হামরাউল আসাদে** দেখে এসেছি আর এমন প্রতাপশালী সেনাবাহিনী আমি কখনও দেখি নি। উহুদের পরাজয়ের অনুতাপে তাদের মাঝে এমন উত্তেজনা বিরাজ করছে যে, তোমাদেরকে দেখামাত্রই নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের ওপর মা'বাদের কথায় এমন প্রভাব পড়ে যে, তারা পুনরায় মদীনা যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। কুরাইশদের সৈন্যবাহিনীর এভাবে পলায়ন করার সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এটি খোদারই প্রতাপ যা তিনি কাফিরদের হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন। এরপর তিনি (সা.) হামরাউল আসাদে আরো দু'তিনদিন অবস্থান করেন।' **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫০৪-৫০৫)**

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ: বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরী সনের শা'বান মাসে। এই যুদ্ধকে **মুরায়সীর যুদ্ধ**ও বলা হয়। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, 'কুরাইশদের বিরোধিতা প্রতিনিয়ত আরো ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করছিল। তারা তাদের শত্রুতা বা ষড়যন্ত্র দ্বারা আরবের বহু গোত্রকে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের শত্রুতা এক নতুন শঙ্কা সৃষ্টি করে দিয়েছে আর তা হল, হেজাযের যেসব গোত্র মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক রাখত, তারাও এখন কুরাইশদের নৈরাজ্যের দরুন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিল নামকরা গোত্র বনু খুযাআ। আর এদেরই একটি শাখা বনু মুস্তালিক মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয় এবং তাদের নেতা হারেস বিন আবী যিরার অত্রাঞ্চলের অন্যান্য গোত্রে সফর করে আরো কিছু গোত্রকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি বাড়তি সতর্কতা

হিসেবে বুরায়দাহ্ বিন হুসায়েব (রা.) নামক নিজের এক সাহাবীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বনু মুস্তালিক (গোত্রের) কাছে প্রেরণ করেন এবং তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, তিনি যেন যতদ্রুত সম্ভব ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। বুরায়দাহ্ (রা.) সেখানে গিয়ে দেখেন, সত্যিই অনেক বড় একটি জমায়েত এবং খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদীনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলছে। তিনি ত্বরিতগতিতে ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবগত করেন এবং তিনি (সা.) যথারীতি মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষার জন্য বনু মুস্তালিক অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং অনেক সাহাবী তাঁর (সা.) সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, এমনকি মুনাফিকদেরও একটি বড় সংখ্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, যারা এর আগে কখনো এত বড় সংখ্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। মহানবী (সা.) নিজের অনুপস্থিতিতে হযরত আবু যার গিফারী (রা.) অথবা কোন কোন বর্ণনানুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। বাহিনীতে কেবল ত্রিশটি ঘোড়া ছিল, যদিও উটের সংখ্যা কিছুটা বেশি ছিল। এই উট ও ঘোড়াতেই পালাক্রমে আরোহণ করে মুসলমানরা সফর করে। পথিমধ্যে মুসলমানরা কাফিরদের এক গুপ্তচরকে পেয়ে যায়। তারা তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত করে। সে যে আসলেই কাফিরদের গুপ্তচর এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে কাফিরদের অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে জানতে চান, কিন্তু সে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানায়। আর যেহেতু তার আচরণ সন্দেহজনক ছিল তাই প্রচলিত যুদ্ধ রীতি অনুসারে হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করেন আর এরপর ইসলামী সৈন্যবহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়। বনু মুস্তালিক গোত্র যখন জানতে পারে যে, মুসলমানদের আগমন আসন্নপ্রায়, আর এই সংবাদও পায় যে, তাদের গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ করা। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে এখন তাদের **'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'** অবস্থা হয়। তারা খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, আর অন্যান্য যেসব গোত্র তাদেরকে সাহায্য করতে এসেছিল, ঐশী পরিকল্পনার দরুন তারা এমন ভয় পেয়ে যায় যে, তারা তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যায়। কিন্তু বনু মুস্তালিককে কুরাইশরা মুসলিম-বিদ্বেষের নেশায় এতটা মাতাল করে দিয়েছিল যে, তারা তবুও যুদ্ধ করার ইচ্ছা থেকে বিরত হয় নি এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী বাহিনীর মোকাবিলার জন্য বসে থাকে। মহানবী (সা.) যখন মুরায়সী নামক স্থানে পৌঁছেন, যার পাশেই বনু মুস্তালিকের শিবির ছিল এবং যা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সমুদ্র উপকুলবর্তী একটি জায়গার নাম, তখন তিনি (সা.) সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন। সৈন্যদের সারিবদ্ধ করা এবং পতাকা বিতরণের পর তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন এগিয়ে গিয়ে বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে ঘোষণা প্রদান করেন যে, যদি এখনও তারা ইসলামের শত্রুতা পরিহার করে এবং মহানবী (সা.) এর শাসন মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে আর মুসলমানরা ফিরে যাবে। কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে (এ প্রস্তাব) প্রত্যাখ্যান করে আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনকি বর্ণিত আছে, এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম যে তির নিক্ষেপ করা হয় তা তাদেরই একজন করেছিল। মহানবী (সা.) তাদের এই আচরণ প্রত্যক্ষ করার পর তিনিও সাহাবীদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। শত্রুপক্ষ বা বিরোধীরা যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিল। দু'পক্ষের মধ্যে স্বল্পক্ষণ তির বিনিময় হয়। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের

সম্মিলিতভাবে আক্রমন করার নির্দেশ দেন যে, একযোগে আক্রমণ কর। আর এই আকস্মিক আক্রমনের ফলে কাফির বাহিনীর পা হড়কে যায়। কিন্তু মুসলমানরা এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলে যে, পুরো জাতি অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র দশজন কাফির এবং একজন মুসলমানের মৃত্যুর মাধ্যমে এই যুদ্ধ, যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারত, তা সমাপ্ত হয়।'

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন, 'এক্ষেত্রে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক, এ যুদ্ধ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিক গোত্রের ওপর এমন সময় আক্রমন করেছিলেন যখন তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে, এই বর্ণনা ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; বরং দু'টি বর্ণনা দু'টো ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ, ঘটনাটি হল, ইসলামী সৈন্যবাহিনী যখন বনু মুস্তালিকের কাছাকাছি পৌঁছে তখন তারা মুসলমান বাহিনীর আগমনের কথা জানলেও মুসলমানরা একেবারে কাছে এসে গেছে- একথা তারা জানতো না; তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে (যুদ্ধের জন্য) অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। আর বুখারীর হাদীসে সেই অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের আসার সংবাদ পাওয়ার পর তারা তাদের পূর্ব প্রস্তুতি অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়; আর এই অবস্থার কথাই ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। এই মতভিন্নতার এরূপ ব্যাখ্যাই আল্লামা ইবনে হাজার এবং অন্যান্য কতিপয় গবেষক করেছেন, আর এটিই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়।' **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫৫৭-৫৫৯)**

বনু মুস্তালিকের (যুদ্ধ) থেকে ফেরার পথে আরো একটি ঘটনাও ঘটে; সহীহ্ মুসলিমে এর বিবরণ রয়েছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক যুদ্ধে অর্থাৎ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন মুহাজিরদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি আনাসারদের কোন একজনের পিঠে আঘাত করে। তখন সেই আনসারী 'হে আনসারগণ' (বলে ডাক দেয়), আর মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজিরগণ' (বলে ডাক দেয়)। অর্থাৎ আনসার এবং মুহাজির উভয়ে নিজ নিজ দলের লোকদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়। মহানবী (সা.)-এর নিকট এ বিষয়টি পৌঁছার পর তিনি (সা.) বলেন, এ কেমন অজ্ঞতার যুগের কথাবার্তা হচ্ছে? [অর্থাৎ তিনি (সা.) যখন এই হইচই শুনতে পান, তখন।] তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একজন মুহাজির আনসাদের এক ব্যক্তির পিঠে আঘাত করেছে। একথা শুনে তিনি (সা.) বলেন, এসব কথা বাদ দাও, এগুলো মন্দ কথা। এ ধরনের অনর্থক কথা বলো না, সামান্য সামান্য কথায় ঝগড়াবিবাদ শুরু করে দিও না! আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-ও সেখানে ছিল; সে একথা শোনার পর বলে, উনি তো এমন করেছে, [অর্থাৎ একজন মুহাজির এক আনসারের কোমরে আঘাত করেছে, সে হয়ত একটা থাপ্পড়ই মেরেছিল বা হয়ত দু'টো থাপ্পড়ই মেরেছিল;] কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে অবশ্যই সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ্) সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দিবে। (একথা শুনে) হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে এই মুনাফিকের (তথা কপট ব্যক্তির) শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) বলেন, বাদ দাও। পাছে লোকজন আবার একথা না বলে বেড়ায় যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজ সঙ্গীদের হত্যা করে। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস্ সিলাহ্, বাব নসরুল আখি যালেমান আও মযলুমান, হাদীস নম্বরঃ ৬৫৮৩)**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, যা আমি বাদ দিচ্ছি, কেননা ইতিপূর্বেই এটি আমি বর্ণনা করেছি। যাহোক, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর শেষ সময়ের অবস্থার কথা উল্লেখ করে সীরাত ইবনে হিশামে লেখা আছে, এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই যখনই এমন উল্টোপাল্টা কথা বলত তখন তার জাতির লোকেরাই তাকে চরম অলস বলত। মহানবী (সা.) যখন তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলেন, হে উমর! যেদিন তুমি আমাকে তাকে হত্যা করাতে বলেছিলে, [অর্থাৎ তুমি তাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলে;] সেদিন যদি আমি তাকে হত্যা করিয়ে দিতাম তাহলে মানুষ নাক সিটকাতো। কিন্তু এখন যদি সেসব লোককেই আমি তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করি, তাহলে তারা নিজেরাই তাকে হত্যা করবে। (আজ) দেখ! ধৈর্য ধারণ করার ফলে এবং (বাস্তব) অবস্থা প্রত্যক্ষ করার দরুন একদিন যারা তার সহমর্মী ছিল, তারাই আজ তার বিরোধী হয়ে গেছে। এখন এরা তাকে হত্যা করতেও প্রস্তুত। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অনুধাবন করেছি যে, কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী (সা.)-এর কথা নিঃসন্দেহে আমার কথা অপেক্ষা অনেক মহান ছিল। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭২, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) যখন মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই-এর জানাযার নামায পড়তে উদ্যত হন তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে তার জন্য এস্তেগফার করা বা না করা– দু'টোরই অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই মহানবী (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'লা এধরনের লোকদের জানাযা পড়াতে পুরোপুরি নিষেধ করে দেন, তখন মহানবী (সা.) মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। **(আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রেফাতিল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪১ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী, বৈরুতের দারুল জীল)**

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র বরাতে আবু সালামাহ্ বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) সূর্যাস্তের পর আসেন এবং কাফির কুরাইশদের তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি তো আসরের নামায পড়তে পারি নি, অথচ সূর্যাস্ত হতে যাচ্ছে। মহানবী (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমিও পড়ি নি। তখন আমরা উঠে **বুতহানের** দিকে যাই। **বুতহান**ও মদীনার উপত্যকাগুলোর একটি উপত্যকা। মহানবী (সা.) নামাযের জন্য ওযূ করেন, সাথে আমরাও ওযূ করি এবং সূযাস্তের পর আসরের নামায পড়ি; এরপর তিনি (সা.) মাগরিবের নামায পড়েন। এটি বুখারী শরীফের হাদীস। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব মওয়াকিতিস্ সালাত, বাব মান সাল্লা বিন্নাসি জামাআতান বা'দা যাহাবিল্ ওয়াকত, হাদীস নং: ৫৯৬), (মু'জিমুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন সময় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা কত ওয়াক্তের নামায পড়তে পারেন নি– এ প্রসঙ্গে বিতর্ক হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, একটি বর্ণনা এরূপ যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর (রা.) কাফিরদের তিরস্কার করে বলেন, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে অথচ আমি আসরের নামায পড়তে পারি নি। তিনি (রা.) বলেন, এজন্য আমরা **বুতহান** উপত্যকায় অবতরণ করি এবং তারা সেখানে সূর্যাস্তের পর (আসরের) নামায পড়েন; এরপর মাগরিবের নামায পড়েন। এটিও বুখারী শরীফেরই হাদীস। প্রথম বর্ণনায় ছিল যে, তিনি মহানবী (সা.)-

এর সাথে ছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাব মওয়াকিতিস্ সালাত, বাব কাযাউস্ সালাওয়াতিল উলা ফালউলা, হাদীস নং: ৫৯৮)**

এরপর হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা এই কাফিরদের বাড়িঘর এবং তাদের কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন, কেননা তারা আমাদেরকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ব্যস্ত রেখেছে এবং **'সালাতে উসত্বা'** অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায পড়ারও সুযোগ দেয় নি, অথচ এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে।' **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়াতুল খন্দক ওয়াহিউল্ আহযাব, হাদীস নং: ৪১১১)** হযরত আলী (রা.)'র এই বর্ণনাটিও বুখারী শরীফেরই।

এরপর হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে চার ওয়াক্ত নামায পড়া থেকে বিরত রাখে আর এ অবস্থায় রাতের ততটা অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় যতটা আল্লাহ্ চেয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে আদেশ দিলে তিনি (রা.) আযান দেন। এরপর তিনি (সা.) একামত দিতে বলেন এবং যোহরের নামায পড়ান। পুনরায় একামত দিতে বলেন এবং আসরের নামায পড়ান। মহানবী (সা.) আবার একামত দিতে বলেন এবং মাগরিবের নামায পড়ান। পুনরায় তিনি (সা.) একামত দিতে বলেন এবং এশার নামায পড়ান। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬-৭, মুসনাদ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, হাদীস নং: ৩৫৫৫, বৈরুতের আ'লিমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এরূপ যাবতীয় বর্ণনাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে কেবল একটি বর্ণনাকে সঠিক ও নির্ভুল আখ্যায়িত করেন যাতে স্বাভাবিকের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে আসরের নামায পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চার বেলার নামায 'ক্বাযা' করা সম্পর্কে পাদ্রী ফাতেহ্ মসীহ্‌র আপত্তির উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "খন্দক তথা পরিখা খনন করার সময় চারবেলার নামায 'ক্বাযা' করা হয়েছিল– এটি আপনার ওপর শয়তানী প্ররোচনা। প্রথমত আপনাদের জ্ঞানের বহর হল, (এক্ষেত্রে) 'ক্বাযা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ওহে মূর্খ! 'ক্বাযা' নামায আদায় করাকে বলা হয়, (নামায পরিত্যাগ করাকে নয়!) নামায পরিত্যাগ করাকে কখনোই 'ক্বাযা' বলা হয় না। যদি কারও নামায বাকি রয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'ফওত', (অর্থাৎ নামায 'ফওত' হয়ে গেছে।) আমরা কি এজন্যই পাঁচ হাজার রুপি (পুরস্কার ঘোষণা করে) বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যেন এমন নির্বোধও ইসলামের প্রতি আপত্তি করে, যে এখনো 'ক্বাযা' শব্দের অর্থই জানে না! যে ব্যক্তি যথাস্থানে শব্দের প্রয়োগই করতে পারে না সেই নির্বোধ কীভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে সমালোচনা করার যোগ্যতা রাখতে পারে? বাকি রইল– খন্দক তথা পরিখা খননের সময় চারবেলার নামায একত্রে পড়া হয়েছিল; তো এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্ররোচনার উত্তর হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্মে কোন কাঠিন্য নেই, অর্থাৎ এমন কোন কঠোরতা নেই যা মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। এজন্য তিনি প্রয়োজনের সময় এবং সংকটময় পরিস্থিতিতে নামায একত্রে পড়ার এবং সংক্ষিপ্ত করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কোন নির্ভরযোগ্য হাদীসে চারবেলার নামায একত্রে পড়ার উল্লেখ নেই। বরং সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে, ঘটনা কেবল এতটুকুই ঘটেছিল যে, এক বেলার নামায, অর্থাৎ আসরের নামায যথাসময়ের তুলনায় সংকীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল। (এই বিরুদ্ধবাদীকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,) এখন যদি আপনি আমার সামনে থাকতেন তাহলে আপনাকে আমি সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, চারবেলার নামায

'ফওত' হয়েছিল– এরূপ হাদীস কি আদৌ মুত্তাফেক আলাইহে (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস)? তাছাড়া চারবেলার নামায অর্থাৎ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একসাথে পড়া তো শরীয়তের বিধান অনুসারেই বৈধ। তবে হ্যাঁ! একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সহীহ্ হাদীস একে প্রত্যাখ্যান করে আর শুধু এটিই সাব্যস্ত হয় যে, আসরের নামায সংকীর্ণ সময়ে পড়া হয়েছিল।" **(নূরুল কুরআন, নাম্বার-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৯-৩৯০)**

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে হযরত উমর (রা.)'র ভূমিকা সম্পর্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল, মহানবী (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণের উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান যেন তিনি গিয়ে কুরাইশ নেতাদের মহানবী (সা.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবহিত করেন। (তখন) হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের শঙ্কা আছে, কেননা তারা আমার সাথে তাদের শত্রুতা সম্পর্কে (বিশেষভাবে) অবগত। তারা জানে, আমি কুরাইশদের কত বড় শত্রু এবং আমি তাদের প্রতি কতটা কঠোরতা করি। এছাড়া আমার গোত্র বনু আদী বিন কা'ব-এর কেউই মক্কায় নেই যে আমাকে রক্ষা করবে। এজন্য তিনি কিছুটা সংকোচ প্রকাশ করেন। এক বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা.) তখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে আরো নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি চাইলে আমি তাদের নিকট যাচ্ছি, কিন্তু মহানবী (সা.) কিছুই বলেন নি। হযরত উমর (রা.) আরও নিবেদন করেন, আমি আপনাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছি যিনি কুরাইশদের নিকট আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত, অর্থাৎ হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)। তখন মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে এনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতার নিকট প্রেরণ করেন যেন হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে অবগত করেন যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেন নি; তিনি (সা.) কেবল কা'বার যিয়ারত এবং এর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এসেছেন। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৮৫, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত), (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬, ফী গযওয়াতুল হুদাইবিয়াহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় এ বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিল তখন মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল বেড়ি ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় বহু কষ্টে সেই সভায় এসে উপস্থিত হয়। মুসলমান হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এই যুবককে বন্দী করেছিল এবং চরম নির্যাতনের মধ্যে রেখেছিল। সে যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কার এতটা নিকটে এসেছেন, তখন সে কোনক্রমে মক্কাবাসীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে বেড়িতে আবদ্ধ অবস্থায় পড়িমড়ি করে হুদাইবিয়ায় পৌঁছে যায়। আর ঘটনাক্রমে সে সেই সময়ই উপস্থিত হয় যখন তার পিতা চুক্তির এই শর্ত লেখাচ্ছিল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে মুসলমানদের কাছে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফেরত পাঠাতে হবে, যদি সে মুসলমান হয় তবুও। আবু জান্দাল পড়িমড়ি করে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয় এবং বেদনাতুর কণ্ঠে চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! কেবল ইসলামের জন্যই আমাকে এমন নিদারুণ শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে আমাকে রক্ষা কর! এ দৃশ্য দেখে মুসলমানরা ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কিন্তু সুহায়েলও গোঁ ধরে বসে এবং মহানবী (সা.)-কে বলে, এই চুক্তি অনুযায়ী আপনার কাছে আমি আমার প্রথম যে দাবি উপস্থাপন করছি তা হল, আবু জান্দালকে আমার হাতে তুলে দিন। তখন মহানবী (সা.)

বলেন, এই চুক্তি তো এখনও সম্পাদনই হয় নি; (আলোচনা চলছে মাত্র, এখনও চূড়ান্ত হয় নি।) সুহায়েল বলে, আপনি যদি আবু জান্দালকে ফেরত না দেন তাহলে ধরে নিন– এই চুক্তি-কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। মহানবী (সা.) (বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য) বলেন, আরে বাদ দাও না! আবু জান্দালকে না হয় অনুগ্রহস্বরূপ ও মানবতার খাতিরেই আমাদেরকে দিয়ে দাও। সুহায়েল বলে, না না, এটি কখনোই মানব না! তিনি (সা.) বলেন, সুহায়েল! হঠকারী না হয়ে আমার কথা মেনে নাও। সুহায়েল বলে, এ বিষয়টি আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না। এ সময়ে আবু জান্দাল আবার চিৎকার করে বলে, হে মুসলমানেরা! তোমাদের এক মুসলমান ভাইকে কি এভাবে এই চরম নির্যাতিত অবস্থায় মুশরিকদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে? এটি একটি আশ্চর্যের বিষয় যে, তখন আবু জান্দাল মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করে নি, বরং সাধারণ মুসলমানদের কাছে নিবেদন করে। সম্ভবত এর কারণ এটি ছিল যে, সে জানতো, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যতই বেদনা থাকুক না কেন– চুক্তি-কার্যক্রমে তিনি (সা.) কোনক্রমেই কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে দিবেন না। কিন্তু সম্ভবত সাধারণ মুসলমানদের কাছে সে এই আশা করেছিল যে, তারা হয়ত আত্মাভিমানের ফলে, যখন কেবলমাত্র সন্ধির শর্ত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন এমন কোন উপায় বের করবে যার ফলে তার মুক্তির ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মুসলমনরা যত উত্তেজিতই থাকুক না কেন, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কোন পদক্ষেপ নিতে পারত না। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব্যথাতুর কণ্ঠে আবু জান্দালকে বলেন, হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ কর আর খোদা তা'লার প্রতি দৃষ্টি রাখ। খোদা তা'লা তোমার জন্য এবং তোমার মতো অন্যান্য দুর্বল মুসলমানের জন্য অবশ্যই স্বয়ং কোন উপায় বের করবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা নিরুপায়, কেননা মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে আর আমরা এই চুক্তি-বিরোধী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব না।

মুসলমানরা এই দৃশ্য দেখছিল আর ধর্মীয় আত্মাভিমানে তাদের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সামনে ভয়ে তারা নিশ্চুপ ছিল। অবশেষে হযরত উমর (রা.) আর সইতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যান আর কম্পমান কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদা তা'লার সত্য রসূল নন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই (আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসূল)। উমর (রা.) বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নই আর আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর নয়? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, বিষয় এমনই। উমর (রা.) বলেন, তাহলে আমরা আমাদের সত্য ধর্মের বিষয়ে এই অপমান কেন সহ্য করব? তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.)'র অবস্থা দেখে সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন, দেখ উমর! আমি খোদার রসূল। আমি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় জানি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারি না। আর তিনিই আমার সাহায্যকারী, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই আমার সাহায্যকারী।) কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র ক্ষোভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আপনি কি আমাদের এ কথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করব। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি এটিও বলেছিলাম যে, এই তওয়াফ নিশ্চিতভাবে এ বছরই হবে। উমর (রা.) বলেন, না, এমনটি বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা কর। তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহ তওয়াফ তথা প্রদক্ষিণ করবে। কিন্তু এই উত্তেজিত অবস্থায় হযরত উমর (রা.) আশ্বস্ত হন নি। তথাপি মহানবী (সা.)-এর যেহেতু বিশেষ প্রতাপ ছিল, তাই হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে সরে

গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন আর তাঁর সাথেও একই রকম উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও সেরূপই উত্তর দেন, কিন্তু একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) উপদেশস্বরূপ বলেন যে, দেখ উমর! সতর্ক থাক। আর আল্লাহ্‌র রসূলের রেকাবে তুমি যে হাত রেখেছ, তা আলগা হতে দিও না। কেননা খোদার কসম! এই ব্যক্তি, যাঁর হাতে আমরা নিজের হাত দিয়েছি, অবশ্যই সত্য। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি নিজ উত্তেজনায় যদিও এসব কথা বলেছি, কিন্তু পরবর্তীতে আমি খুবই অনুতপ্ত হই, আর আমি তওবা হিসেবে এই দুর্বলতার প্রভাবকে দূর করার জন্য বহু নফল আমল বা ইবাদত করি, অর্থাৎ সদকা করি, রোযা রাখি, নফল নামায পড়ি, ক্রীতদাস মুক্ত করি, যেন আমার এই দুর্বলতার দাগ মুছে যায়।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৭৬৬-৭৬৮)**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর খিলাফতের পূর্বে জলসায় একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি জলসায় বক্তৃতা দিতেন। তা থেকে এ সম্পর্কিত একটি অংশ আমি বর্ণনা করছি, তিনি (রাহে.) বলেন, "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যাথা ও অস্থিরতার সেই চিৎকার, যা প্রশ্নাকারে হযরত উমর (রা.)'র হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে (তা) আরও অনেক হৃদয়েও প্রচ্ছন্ন ছিল। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যেসব আবেগকে হযরত উমর (রা.) ভাষা দিয়েছেন, সেগুলো কেবল উমর (রা.)'র একার আবেগই নয় বরং অন্যদেরও ছিল। আর শত শত হৃদয়ে এরূপ চিন্তাভাবনা উত্তেজনা সঞ্চার করে রেখেছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র সেগুলো প্রকাশের সাহস দেখানো এমন এক ভুল হয়েছে যে, এরপর হযরত উমর (রা.) সারাজীবন এজন্য অনুতপ্ত ছিলেন। তিনি অনেক রোযা রাখেন, অনেক ইবাদত করেন, অনেক সদকা দেন, আর এস্তেগফার করতে করতে সিজদাস্থলকে সিক্ত করেন; কিন্তু অনুতাপের পিপাসা নিবারণ হয় নি। হুদাইবিয়ার উৎকণ্ঠা তো সাময়িক ছিল, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ আশিসরাজি অতি দ্রুত প্রশান্তিতে বদলে দেয়; কিন্তু অধৈর্য্য হয়ে করা এই প্রশ্নের কারণে উমর (রা.)'র হৃদয়ে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছিল, তা এক স্থায়ী উৎকণ্ঠায় রূপ নেয়, যা কখনও তাঁর পিছু ছাড়ে নি। সর্বদা আক্ষেপের সাথে তিনি এটিই বলতেন; হায়! আমি যদি মহানবী (সা.)-কে সেই প্রশ্নটি না করতাম! তিনি (রাহে.) বলেন, অনেকবার আমি এটি চিন্তা করেছি যে, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাসের সময় হযরত উমর (রা.) যখন **'লা লী ওয়ালা আলাইয়্যা'** জপ করছিলেন যে, **'হে খোদা! আমি তোমার কাছে নিজের পুণ্যের প্রতিদান চাই না, তুমি আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর'**; তখন সকল ভুলের চেয়ে সেই একটি ভুলের কল্পনা তাকে বেশি বিচলিত করে থাকবে, যা হুদাইবিয়ার মাঠে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। সন্ধিচুক্তি লেখার সময় সাহাবীদের উদ্বেগ এবং হতাশার চিত্র দেখে মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের অবস্থার রহস্য তাঁর (সা.) ঐশী প্রভু এবং পরম আদরণীয়, সর্বোত্তম বন্ধু ছাড়া আর কেউ জানতো না। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র কথার উত্তরে যে তিনটি মাত্র বাক্য তাঁর (সা.) মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তাতে চিন্তাশীলদের জন্য তিনি (সা.) অনেক কিছু বলে দিয়েছেন।" **{খিতাবাতে তাহের (খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পূর্বে প্রদত্ত জলসার বক্তৃতাদি) পৃঃ ৪২৮}**

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে মুসলমান এবং কুরাইশদের মাঝে যে চুক্তি (সম্পাদিত) হয়েছিল তাতে হযরত উমর (রা.)'রও স্বাক্ষর ছিল। এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, "এ চুক্তির দু'টি কপি প্রস্তুত করা হয় এবং সাক্ষী হিসেবে উভয়পক্ষের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি এতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্দুর

রহমান বিন অওফ (রা.), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবু উবায়দাহ্ (রা.) ছিলেন। চুক্তি সম্পাদনের পর সুহায়েল বিন আমর চুক্তির একটি কপি নিয়ে মক্কায় ফিরে যায় আর দ্বিতীয় কপিটি ছিল মহানবী (সা.) এর কাছে।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৭৬৯)**

হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লেখা আছে যে, কুরবানী ইত্যাদি শেষ করে মহানবী (সা.) মদীনায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন তাঁর হুদাইবিয়ায় আসার প্রায় বিশ দিন হয়ে গিয়েছিল। ফিরতি যাত্রায় যখন তিনি (সা.) **'উসফান'** এর নিকট **'কুরাউল্ গামীম'**-এ পৌঁছেন, (**উসফান** মক্কা থেকে ১০৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত, আর **'কুরাউল্ গামীম', উসফান** থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা।) আর এটি ছিল রাতের বেলা, (তিনি) ঘোষণা করিয়ে সাহাবীদেরকে একত্রিত করেন এবং বলেন, আজ রাতে এমন একটি সূরা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে প্রিয়। আর সেটি হল, {সূরা ফাতাহ্ সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন,} إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (এগুলো) সূরা আল্ ফাতাহ্'র ২ থেকে ৪ নম্বর আয়াত। এরপর এভাবেই চলমান থাকে। আর শেষে ২৮ নম্বর আয়াত হল, لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ অর্থাৎ, **'হে রসূল! আমরা তোমাকে এক মহান বিজয় দান করেছি; যেন আমরা তোমার জন্য এমন এক যুগের সূচনা করি যাতে তোমার পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় দুর্বলতা ক্ষমা করে দেয়া হয়, আর যেন খোদা তা'লা স্বীয় কল্যাণরাজি তোমার জন্য পূর্ণ করে দেন এবং তোমার জন্য সফলতার সোজা পথ উন্মুক্ত করে দেন। আর খোদা তা'লা অবশ্যই তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করবেন।'**... সত্য কথা হল এই যে, খোদা তা'লা স্বীয় রসূলের এই স্বপ্ন পূর্ণ করে দেন যা তিনি তাকে দেখিয়েছিলেন, কেননা এখন তুমি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্য অবশ্যই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে আর কুরবানীর (পশুগুলোকে) খোদার পথে উৎসর্গ করে নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে আর তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। অর্থাৎ, এ বছর তোমরা যদি মক্কায় প্রবেশ করতে তাহলে এই প্রবেশ করা শান্তিপূর্ণ হতো না, বরং যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী প্রবেশ হতো, কিন্তু খোদা তা'লা স্বপ্নে শান্তিপূর্ণ প্রবেশ দেখিয়েছিলেন। এজন্য খোদা তা'লা এ বছর সন্ধির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, আর এখন অচিরেই তোমরা খোদার দেখানো স্বপ্ন অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। অতএব এমনটিই হয়েছে।

মহানবী (সা.) যখন এই আয়াতসমূহ সাহাবীদেরকে শোনান, যেহেতু কতক সাহাবীর হৃদয়ে তখনও হুদাইবিয়ার সন্ধির তিক্ততা বিদ্যমান ছিল, তাই তারা (এটি ভেবে) বিস্মিত হয় যে, আমরা তো বাহ্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি, অথচ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয়ের অভিবাদন জানাচ্ছেন! এমনকি কোন কোন ত্বরাপরায়ণ সাহাবী এমন কথাও বলে বসেন যে, **আমরা বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছি– এটাই কি বিজয়?** এ কথা জানতে পেরে মহানবী (সা.) খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় জোরালোভাবে বলেন, এটি একেবারেই বাজে আপত্তি, কেননা গভীর দৃষ্টিপাতে বুঝা যায় যে, সত্যিকার অর্থেই হুদাইবিয়ার সন্ধি আমাদের জন্য অনেক বড় একটি বিজয়। কুরাইশরা যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, (এখন) তারা নিজেরাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে

শান্তিচুক্তি করেছে এবং আগামী বছর আমাদের জন্য মক্কার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কাবাসীর নৈরাজ্য থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিজয়ের সৌরভ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। অতএব, নিশ্চিতভাবে এটি এক মহান বিজয়। তোমরা কি সেসব দৃশ্য বিস্মৃত হয়েছ যে, এই কুরাইশরাই উহুদ এবং আহযাবের যুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে কীভাবে চড়াও হয়েছিল? আর এই ভূপৃষ্ঠ প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের দৃষ্টি নিথর হয়ে গিয়েছিল এবং (ভয়ে) প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হত! অথচ আজ সেই কুরাইশরাই তোমাদের সাথে শান্তি ও সন্ধিচুক্তি করছে। সাহাবীগণ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা বুঝে গিয়েছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনার মত দূরদৃষ্টি আমরা রাখি না, কিন্তু এখন আমরা বুঝে গিয়েছি যে, সত্যিই এ চুক্তি আমাদের জন্য এক মহান বিজয়।

মহানবী (সা.)-এর এই বক্তৃতার পূর্বে হযরত উমর (রা.)ও অনেক দ্বিধান্বিত ছিলেন। অতএব, তিনি (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন, "হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় মহানবী (সা.) যখন রাতের বেলা সফরে ছিলেন, তখন আমি তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁকে (সা.) সম্বোধন করে কিছু নিবেদন করতে চাইলে তিনি (সা.) নীরব থাকেন। আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার নিবেদন করি কিন্তু তিনি (সা.) আগের মতোই নীরব থাকেন। মহানবী (সা.)-এর নীরবতায় আমি ভীষণ দুঃখ পাই এবং আমি মনে মনে এই কথা বলতে থাকি যে, হে উমর! তুই তো ধ্বংস হয়ে গেছিস, কেননা তিনবার মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা সত্ত্বেও তিনি (সা.) নীরব ছিলেন, আমি মুসলমানদের দল থেকে সবার সামনে চলে যাই এবং এই দুঃখে অস্থির হয়ে পড়ি যে, ব্যাপার কী? আর আমার মনে এই আশংকা সৃষ্টি হয় যে, পাছে আমার ব্যাপারে আবার কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ না হয়ে যায়? এর মধ্যেই কোন একজন আমার নাম ধরে ডেকে বলে, উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে মহানবী (সা.) স্মরণ করেছেন। আমি (মনে মনে) বলি, নিশ্চয় আমার বিষয়ে কোন কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর আমি বিচলিত হয়ে ত্বরিৎ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং সালাম দিয়ে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি (সা.) বলেন, আমার প্রতি এই মুহূর্তে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে জগতের সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। এরপর তিনি (সা.) সূরা ফাতাহ্‌'র আয়াতগুলো পাঠ করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সন্ধি কি সত্যিই ইসলামের বিজয়? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের বিজয়। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) আশ্বস্ত হয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।" **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) প্রণীত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ৭৭০-৭৭২), (ফরহঙ্গে সীরাত পৃ: ২০০, ২৪৩)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.) মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধিচুক্তি করেন, যার ফলে সাহাবীদের মাঝে এত বেশি অস্থিরতা সৃষ্টি হয় যে, হযরত উমর (রা.)'র মত মানুষ মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা কি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, আমরা কা'বাগৃহ তওয়াফ করব? অথবা ইসলামের বিজয় কি সুনিশ্চিত নয়? মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, কেন নয় (অবশ্যই)। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে সন্ধি কেন করেছি? মহানবী (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা তওয়াফ করব, কিন্তু একথা বলেন নি যে, এ বছরই করব।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩০তম খণ্ড, পৃ: ২২০)**

হযরত উমর (রা.)’র স্মৃতিচারণ চলছে আর আগামীতেও চলবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হল, মুকাররম মালিক মুহাম্মদ ইউসুফ সেলিম সাহেবের, যিনি অনুলিখন বিভাগের প্রধান ছিলেন। ৮৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি তার বংশে একমাত্র আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তার বড় ভাই তাকে রেলওয়েতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তৎকালীন (রেলের) চীফ ইঞ্জিনিয়ার মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব একজন আহমদী ছিলেন। সেখানে নিয়মিত আল্ ফযল (পত্রিকা) যেত এবং মীর হামিদুল্লাহ্ সাহেব তবলীগও করতেন। তিনি (অর্থাৎ মালিক সেলিম সাহেব) আল্ ফযল পড়ে আহমদী হয়েছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা যখন তার আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে অবগত হয় তখন তারা তাকে অনেক ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, এমন কি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে বলে, কিন্তু তিনি নিজের বাড়িঘর ত্যাগ করলেও; আহমদীয়াত ছাড়েন নি। অবশেষে আশংকা যখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় তখন তার ঘরবাড়ি ত্যাগ করার ঘটনা কিছুটা এরূপ যে, এক রাতে তার মা তার ভাইদের অগোচরে চুপিচুপি বলেন, (তুমি) এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনও এখানে ফিরে এসো না, অন্যথায় তোমার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে। তিনি লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে স্নাতকোত্তর করেন। অতঃপর ১৯৫৮ সালে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে জামেয়া পাশ করেন। এরপর তৎকালীন মুফতী সিলসিলাহ্ মোহতরম মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে ইফতা বিভাগে তার পদায়ন হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি ‘যূদ নবীসী’ তথা অনুলিখন বিভাগে বদলি হন, যখন ‘যুদ নবীসী’ তথা অনুলিখন বিভাগের প্রধান মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব তাহের সাহেবের ইন্তেকাল করেন তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে উক্ত বিভাগে তার স্থলে নিজ সান্নিধ্যে নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত ‘যুদ নবীসী’ তথা অনুলিখন বিভাগের প্রধান ছিলেন। অনুলিখন বিভাগে তার দায়িত্ব ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র বিভিন্ন খুতবা, বক্তৃতা, অনুষ্ঠানাদির প্রতিবেদন ও ভ্রমণ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ। ১৯৭৮ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত **‘কাসরে সলীব’** সম্মেলনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যোগদান করেছিলেন। সেই যাত্রায় তিনিও হুযূর (রাহে.)’র সহযাত্রী ছিলেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)’র সাথে ‘সওয়ানেহ্ ফযলে উমর’-এর প্রস্তুতিতেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সালে যখন অস্ট্রেলিয়া, ফিজী এবং সিঙ্গাপুর সফর করেছিলেন তখন মালিক ইউসুফ সেলিম সাহেবও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। আর হিজরতের পর জুমুআর খুতবার অডিও ক্যাসেট-এর কপি করার কাজও তিনি অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করেন। যেহেতু সতর্ক থাকতে হতো, তাই নিজে ফয়সালাবাদ গিয়ে কোন ঘরে বসে অডিও ক্যাসেট প্রস্তুত করতেন এবং সাথে নিয়ে ফিরতেন। তিনি মুরব্বী হিসেবে কয়েক বছর ফিল্ডেও ছিলেন। তাহের ফাউণ্ডেশনের অধীনে খুতবাতে তাহের এর কাজ করারও তৌফিক পেয়েছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে মজলিসে শূরার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করারও সৌভাগ্য পেয়েছেন। যাহোক, অবসর গ্রহণের পরেও বার বার তাকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশেষে ২০১৩ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করেন। তার দু’টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম

স্ত্রী'র ঘরে তার এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার স্ত্রী মারা যান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। যে ঘরে তার দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে রয়েছে।

মরহুমের মেয়ে কুদসীয়া মাহমুদ সরদার লিখেন, আমাদের পিতা আল্লাহ্‌র সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং আমাদেরকেও এই বিষয়ে জোর তাগিদ দেন। অত্যন্ত কঠোরভাবে নামাযের অভ্যাস করাতেন। বিলম্বে নামায পড়লে অসন্তুষ্ট হতেন। তাহাজ্জুদে অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন। প্রতিদিন এক পাড়া পবিত্র কুরআন পড়তেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও সর্বদা নামাযের সময় জিজ্ঞেস করতেন। নামাযের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের অনুপ্রেরণা গভীরভাবে প্রোথিত করেছেন। খিলাফতের প্রতি তার অপরিসীম ভালোবাসা ছিল। তিনি বলতেন, খিলাফতের আনুগত্যের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত। আহমদীয়াতের খাতিরে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী রশীদ তৈয়্যব সাহেব বলেন, তৃতীয় খিলাফতের যুগে মালিক মুহাম্মদ ইউসুফ সেলিম সাহেব অনুলিখন বিভাগে যোগদান করেন। এই বিভাগে তিনি দীর্ঘকাল সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ইত্যাদি লিখিত রূপ দান করতেন। জামা'তী পত্রিকা আল্ ফযলের জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করতেন। একান্ত দায়িত্বের সাথে, সুশৃঙ্খলভাবে ও উন্নত পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তার সাহিত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। আর যেমনটি আমি বলেছি, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে তার বহির্বিশ্ব সফরে ইউরোপে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে নিজের কাজ করতেন। প্রতিটি শব্দ লেখার ক্ষেত্রে অনেক চিন্তাভাবনা ও সতর্কতা অবলম্বন করতেন আর দোয়া করে লিখতেন যাতে মূল অর্থের সাথে কোন পার্থক্য থেকে না যায়। ২০১৩ সালে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখনও শূরার রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে যখনই তাকে ডাকা হতো তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতেন আর সর্বদা এ কথাই বলতেন যে, আমি এটিকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি।

(হুযূর বলেন) আমার মাথায়ও সর্বদা তার সম্পর্কে এই চিত্রই রয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির একজন মানুষ, যিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন আর ওয়াক্‌ফের সকল শর্তও তিনি যথাযথভাবে পূরণ করেছেন। নীরবে সকল কাজ করতেন। কোন ধরনের চাহিদা ছিল না। খুবই সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন। (আর) তার সন্তানদেরকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ ওয়াকফে যিন্দেগী জনাব শোয়েইব আহমদ সাহেবের, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম বশীর আহমদ কালা আফাগানী সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৮৭ সালে তিনি জামা'তের চাকরিতে যোগদান করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নাযের হিসেবে সেবা করেছেন। দপ্তরে উলীয়ার ইনচার্জ, অডিটর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, নাযের বায়তুল মাল (খরচ), নাযেম ওয়াকফে জাদীদ মাল, অফিসার জলসা সালানা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া ভারতের সদর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার সেবাকাল ৩৩ বছরেরও অধিক। ইবাদতের প্রতি তার গভীর মনোযোগ ছিল। নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। মরহুমের খিলাফতের আনুগত্যের মানও অনেক উন্নত ছিল। সবসময় বলতেন, যে নির্দেশই আসে, তা তৎক্ষণাৎ পালন করতে হবে। পবিত্র

কুরআনের গভীর জ্ঞান রাখতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও জামা'তের খলীফাদের রচনাবলীও অধ্যয়ন করতেন। ধর্মীয় জ্ঞানও ব্যাপক ছিল। সকল বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা রাখতেন। অত্যন্ত সদাচারী ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। অভাবী ও অধীনস্থদের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। কাদিয়ানের প্রত্যেক ব্যক্তিই তার খুব প্রশংসা করছে। আত্মবিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞও ছিলেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র রয়েছে। মরহুম কাদিয়ানের সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর জালালুদ্দীন নাইয়্যার সাহেবের জামাতা ছিলেন।

কাদিয়ানের নায়েব বায়তুল মাল (আয়) রফিক বেগ সাহেব লিখেন, তার সাথে আঠারো বছর যাবৎ ভারতের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং কাদিয়ানের জলসা সালানা দপ্তরে সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তিনি নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অন্যান্য সেবকদের নিজের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। সালানা জলসার সময়ও রাত তিনটা-চারটা পর্যন্ত দপ্তরেই থাকতেন এবং (অতিথিদের) থাকার স্থানগুলোর খোঁজ-খবর নিতেন; কোথাও কম-বেশি দেখতে পেলে সাথে সাথে গিয়ে তা শুধরে দিতেন। প্রত্যেক কর্মীকে সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের যথোপযুক্ত খেয়াল রাখার বিষয়ে জোরালো উপদেশ দিতেন। যদি কোন কর্মীর পক্ষ থেকে কোন অতিথির সাথে দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটতো তবে নিজে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন। তার ভগ্নিপতিও লিখেছেন যে, তিনি বলতেন, আমি পৃথিবীতে কখনও কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করি নি। ওকালতে মাল তাহরীকে জাদীদের একজন ইন্সপেক্টর লিখেন, ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রদেশে তাদের পঁচাত্তর দিনব্যাপী দীর্ঘ প্রাদেশিক সফর ছিল; সফর চলাকালীন আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এমনভাবে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেন যেভাবে কোন পিতামাতা করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদের ধৈর্য ও প্রশান্তি দান করুন এবং মরহুমের পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, কাদিয়ানের মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ মোকাররম মাকসুদ আহমদ ভাট্টি সাহেবের, যিনি গত ১৮ মে, ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের রাজৌরি জেলার চারকোর জামা'তের সদস্য ছিলেন। তার সেবাকাল প্রায় ত্রিশ বছর বিস্তৃত। তিনি লক্ষ্ণৌয়ের আঞ্চলিক আমীর এবং প্রায় এক বছর শ্রীনগরে মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৭ সন থেকে আমৃত্যু ফুল-টাইম কেন্দ্রীয় কাযী হিসেবে সেবার সুযোগ পান। কাযা বা বিচার বিভাগে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ডজন মামলার নিষ্পত্তি করেন। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক চিন্তিত থাকতেন, এমনকি সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে ছিলেন তখনও কাজের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন; তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত মিশুক, প্রফুল্লচিত্ত, সাহসী, সূক্ষ্মদর্শী ও সুদক্ষ ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা ও তিন ভাই ছাড়াও স্ত্রী ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন, তার কন্যাদেরও সুরক্ষিত রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ বহমান রাখার সামর্থ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, ফয়সালাবাদ নিবাসী জাভেদ ইকবাল সাহেবের, যিনি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র তালহা জাভেদ লিখেন যে, তাদের

পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ বাবা চাকীরা'র মাধ্যমে হয়েছিল, তার এই নাম তার চাক্কি বা যাঁতা বানানো ও মেরামত পেশার কারণে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। তিনি অলিগলিতে উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে কাজ করতেন এবং সেসময় তিনি উচ্চস্বরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতে থাকতেন যেন তবলীগের পথও উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি নিয়মিত নামায পড়া ছাড়াও তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন; আবশ্যিকভাবে তাহাজ্জুদ পড়তেন। পরিবারের সদস্যদেরও বাজামা'ত নামায পড়ার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিতেন, বরং বাড়িতে নিয়মিত বাজামা'ত নামায পড়ার ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন, সেইসাথে অনুবাদও পড়তেন। বিশেষ যত্নসহকারে খুতবা শোনার আয়োজন করতেন এবং বাড়ির সদস্যদের সাথে নিয়ে বসে এমটিএ'তে খুতবা শুনতেন। তার মাঝে ধর্মসেবার গভীর উন্মাদনা ছিল। ১৯৮৪'র পরিস্থিতির পর যখন অডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা বিভিন্ন জামা'তে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হতো, তখন একটি কাপড়ের ব্যাগে ক্যাসেট ভরে সাইকেলে চেপে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে খুতবা পৌঁছে দিতেন। আর যখন এমটিএ'র সূচনা হয়, তখন নিজের বাড়িতে ডিশ লাগিয়ে মানুষকে আমন্ত্রণ করে খুতবা শোনানোর ব্যবস্থা করতেন। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার মা, স্ত্রী আমাতুল বাসেত এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুণ।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, শ্রদ্ধেয়া মাদীহা নওয়ায সাহেবার, যিনি ঘানার মুরব্বী সিলসিলা নওয়ায আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। গত ১৬ এপ্রিল, ৩৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ঘানাতেই ছিলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মুরব্বী সাহেব, অর্থাৎ তার স্বামী লিখেন যে, ১৬ বছরের বিবাহিত জীবনে আমি তাকে অগণিত গুণের আধার হিসেবে পেয়েছি। খুবই সাহসী, ধৈর্যশীলা, সহানুভূতিশীলা ও মানবসেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ এক নারী ছিলেন। অতি উত্তম মা ও বিশ্বস্ত সহধর্মিণী ছিলেন। ঘানায় যেখানেই সুযোগ পেতেন, ছোট শিশুদের ক্লাস নিতেন। নিজের সন্তানদের সাথে বসিয়ে কুরআন পড়াতেন। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং কখনও কারও কঠোর আচরণের পাল্টা জবাব দিতেন না, বরং সহ্য করতেন এবং আমাকেও (অর্থাৎ তার স্বামীকেও) সহ্য করতে বলতেন। সার্বক্ষণিক দোয়া করার কথা স্মরণ করাতেন। সন্তানদের তরবীয়তের ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বেশিরভাগ সময়ই সন্তানদেরকে খিলাফতের কল্যাণরাজি সম্পর্কে আলোচনা করতেন। দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহকারিণী, এক পবিত্রাত্মা নারী ছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন সন্তান রেখে গেছেন, যথা ফুরাত সাফী বয়স ১৩ বছর, ফ্যায়যিয়াহ্ বয়স ৮ বছর এবং যাহরা বয়স ১ বছর। মাশা'আল্লাহ্ সব সন্তানই ওয়াক্ফে-নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার দোয়া তার সন্তানদের অনকূলে গ্রহণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৫ জুন, ২০২১, পৃঃ ৫-১০)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)